ত্বাগুতের বাহিনীর শারয়ী হুকুম

ফদ্বিলাতুশ শাইখ আল-মুজাহিদ

আবু আব্দিল্লাহ আল-মানসূর

রহিমাহুল্লাহ





ত্বাগুতের বাহিনীর শারয়ী বিধান

ফদ্বিলাতুশ শাইখ আল-মুজাহিদ
আবু আব্দিল্লাহ আল-মানসুর
রহিমাহুল্লাহ





প্রথম মুদ্রণ
১৪৩৬ হি. ২০১৪ ঈ.

পরিবেশনায়: আল-গুরাবা মিডিয়া
অনুবাদে: আল হিম্মাহ মিডিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল ‘আলামিনের জন্য, সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবাগণের উপর।

হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি সন্তুষ্ট হওয়া অবধি। সকল প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি যখন সন্তুষ্ট হয়ে যান। সকল প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে সরল পথের হেদায়েত দিয়েছেন। আমরা কোনভাবেই হেদায়েত পেতাম না, যদি আল্লাহ হেদায়েত না দিতেন।

প্রিয় ভায়েরা, এই দারসে আমরা কথা বলবো “তাগুতের বাহিনীর বিধান” সম্পর্কে, বি-ইয নিল্লাহ। দারসটি উলায়াত ইয়ামানের শরিয়াহ ফাউন্ডেশন কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। মূল মাসআলাতে যাওয়ার পূর্বে আমরা জানবো, মানুষ এই বিধান সম্পর্কে কি কি মত পোষণ করে। তারপর আমাদের মূল আলোচনা শুরু করবো, বি-ইযনিল্লাহ। প্রথমে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের মতগুলো বিশ্লেষণ করছি। এই মাসআলায় যে মতগুলো পাওয়া তা হলো:

১. একদল মনে করে, তাগুতের বাহিনীর একটা অংশ কাফের, আর বাকিরা মুসলিম। অতঃপর, কারা কাফের, আর কারা কাফের নয় সেটা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে তারা আবার মতানৈক্য শুরু করে।

২. আরেকদল বলে, তাগুতের বাহিনী মুসলিম। কারণ, ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডে তাদের ওজর রয়েছে।

৩. কেউ বলে, বাহিনী দলগতভাবে কাফের, তবে তাদের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম।

৪. কেউ বলেন, বাহিনীর সকল সদস্যই মুরতাদ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যারা তাগুতের বাহিনীকে মুসলিম মনে করে, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা আবার তাদের উপর কাফেরদের আচরণবিধি প্রয়োগ করে। অর্থাৎ, তারা তাদের সম্পদ গনিমাহ হিসেবে গ্রহণ করে, পিছু হটা সৈনিকদের ধাওয়া করে এবং আহতদের ধরে ধরে হত্যা করে। অথচ প্রতিপক্ষ মুসলিম হলে এই ধরনের আচরণ শরিয়াহ সমর্থন করে না। তাই দেখা যায়, কিছু মানুষ একটা নির্দিষ্ট মত সমর্থন করে, কিন্তু কাজের সময় তার উল্টোটা করে। আবার কিছু মানুষ একটা নির্দিষ্ট মানহাজের অনুসরণ করলেও, বাস্তবে তার বিপরীতটাই চর্চা করে। এই জগাখিচুড়ির মূল কারণ, মানহাজগত দূর্বলতা কিংবা তাওহীদের মাসআলাহগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারা; অথবা সঠিক মানহাজের অনুসরণ না করে অন্ধ অনুসরণের ফলেও এমন হয়।

হে ভাইয়েরা, আমাদের সামনে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। আমরা নবী ﷺ ছাড়া আর কাউকে ভুলের উর্ধে মনে করি না; বাকিরা সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে।
কারণ। যেখানে দ্বীনের একটি মাত্র মৌলিক বিধানে বাধা প্রদান করলে মুরতাদ হয়ে যায়, সেখানে এতগুলি বিধান পালনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা, তাদের অবস্থান কোথায়?

তৃতীয় ঈমান ভঙ্গের কারণ: যে তাগুতরা প্রকাশ্যে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা (موالاة كبرى) রয়েছে এই বাহিনীর।

প্রত্যেক মুসলিমের কাছে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান আরব ও মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা মুসলিম নয়, কারণ তারা

আল্লাহর শরিয়াহ পরিত্যাগ করে তাগুতি আইনে বিচার করে, কাফেরদের সাথে মিত্রতা করে, ইসলামকে বিকৃত করে, যমিনে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ায়, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে বিধান রচনা করে, কুফরি আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীন নিয়ে উপহাস করে। তারা নাসারাদের গোলামে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই পালন করে। তারা জগদ্দল পাথরের মতো মুসলিম উম্মাহর বুকে চেপে বসে আছে। আর যে শক্তির উপর ভর করে এই তাগুতরা টিকে আছে তা হলো সেনাবাহিনী। শাসকরা যা চায় সেনাবাহিনী তাই বাস্তবায়ন করে।

সুতরাং, যেহেতু তাদের সমর্থন ও সাহায্য-সহায়তায় তাগুতরা টিকে থাকে, তাই তাগুতের যে হুকুম তাদেরও সেই হুকুম। তাগুতের যে পরিণতি তাদেরও সেই পরিণতি। তাদের দৃষ্টান্ত ফেরাউনের বাহিনীর মতো, যারা ফেরাউনের সাথেই জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। তাদের শাস্তি বরং আরো কঠিন হবে, কারণ তারা দ্বীন বুঝার পরও দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

{وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}

“তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তো তাদেরই একজন।” [সূরা মায়িদাহ ৫১]

মিত্রতার সবচেয়ে কঠিন স্তর হচ্ছে হাত ও যবান দিয়ে সাহায্য করা। আর এরা তাই করে। তারা সরাসরি নাসারাদের সাথে মুওয়ালাত বা কুফরি মিত্রতায় লিপ্ত । এদের হাতেই বাস্তবায়িত হয় নাসারাদের সব বিধিনিষেধ। কারণ, তাদের শাসকরা নাসারাদের গোলাম। ফলে এই সেনাবাহিনী কার্যত নাসারাদের পক্ষসমর্থনকারী, এবং তাদের বিধিনিষেধ বাস্তবায়নকারী। এই যে কাফেরদের নজরদারি-বিমান কিংবা যুদ্ধবিমানগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেনাবাহিনী নিরাপত্তা ছাড়া এগুলো আমাদের আকাশে উড়তে পারতো না। একইভাবে যখন কোনো

মুসলিম মুজাহিদকে নাসারারা বোমা বর্ষণ করে হত্যা করে, তখন এই সেনারা প্রয়োজন হলে তাঁর লাশ সংগ্রহ করে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়। এভাবে তারা মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে চলমান বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। তারা সকলে না করলেও কিছু অংশ করে। আর যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করে না তাদের সম্পর্কে সামনে আলোচনা করবো, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা এমন লোকদেরকেও তাকফীর করেছেন, যারা কাফেরদেরকে ভবিষ্যতে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মাত্র (এখনো করেনি)। তিনি বলেন:

{إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ}

নিশ্চয়ই যারা হেদায়েত পাওয়ার পরও তা পরিত্যাগ করে পিছনে ফিরে গেছে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। * এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে: আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করবো ।" [সূরা মুহাম্মদ: ২৫-২৬], এখানে তারা ভবিষ্যতে কিছু বিষয়ে কাফেরদের পক্ষ সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেবল; এজন্য আল্লাহ তাদেরকে মুরতাদ সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে যারা সরাসরি ইহুদি নাসারাদের সাহায্য করে, মুজাহিদদের উপর বিমান হামলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেয়, যারা তাওহীদরের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য সহায়তা করে, যারা আমেরিকানদের আদেশ পালন করে এবং ইহুদি নাসারাদের দূতাবাস পাহারা দেয়—তাদের হুকুম কি হবে?

কাজেই, তারা যে মুরতাদ –এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তারা ইহুদি-নাসারাদের সাথে মুওয়ালাত তথা, মিত্রতা ও সাহায্য-সহযোগিতা করে। তারা ইহুদি-নাসারাদের অনুগত তাগুত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা (موالاة) করে।

যেই শাসকদের রিদ্দাহ একেবারে দিবালোকের মতো স্পষ্ট, যারা নিজেরাও কোন রাখঢাক ছাড়া খোলাখুলিভাবে ইহুদি–নাসারাদের সাথে মিত্রতার কথা স্বীকার করে। এবং সেনাবাহিনীর কাছেও বিষয়টি অজ্ঞাত বা গোপন কোন কিছু নয়। তারা স্পষ্ট বিবৃতি দেয়– মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যে বৈশ্বিক যুদ্ধ চলছে তাতে তারা ইহুদি-নাসারাদের পক্ষ সমর্থন করে। এই তাগুত শাসকরা সেনাবাহিনীকে কুফরি কাজ করার আদেশ দেয়, আর তারা সেই কুফর বাস্তবায়ন করে। তাহলে কি কুফরের আদেশদাতাকে কাফের বলব, কিন্তু বাস্তবায়নকারী সৈন্যদের জন্য আমরা ওজর সাব্যস্ত করবো?

তাওহীদে মারাত্মক অজ্ঞতা না থাকলে কেউ এ ধরনের ওজর সাব্যস্ত করবে না । তাছাড়া এই শাসকদের রিদ্দাহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত, যাতে কোন ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। তারপরও সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্রবলে এই তাগুত শাসকদের টিকিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

{وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}

“তোমাদের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু বানাবে (অর্থাৎ, সাহায্য-সহযোগিতা করবে), সে তো তাদেরই একজন।” [মায়িদাহ: ৫১], আপনারা কি কখনো দেখেছেন এই সেনাবাহিনী ক্রুসেডার বা ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে? তারা কি কখনো শিয়া রাফেজিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে—যারা উম্মুল মুনিনীন আয়েশা -রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অশ্লিলতার অপবাদ দেয়? যারা জিবরীল আলাইহিস্সালাম-কে খিয়ানতকারী মনে করে, যারা বলে কুরআন অসম্পূর্ণ, যাদের ইতিহাস মুসলিমদের উপর যুলুম-অত্যাচার, গাদ্দারি আর বিশ্বাসঘাতকতায় ভরপুর। যারা মুসলিমদের মসজিদ ধ্বংস করে, যাদের কুফরির বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। এমন জঘন্যতম রাফেজিদেরকে সেনাবাহিনী কখনো প্রতিহত করেছে? কখনো কি দেখেছেন এই সেনাবাহিনী

হিযবুল্লাত, হাওসির মতো মুশরিক রাফেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? বরং আমরা দেখি ইয়ামানে এই সেনাবাহিনী রাফেজিদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বন্দুকের নল সবসময় নিরস্ত্র অসহায় আহলে সুন্নাহর দিকেই থাকে। কাজেই, এরা হলো আমেরিকা ও নাসারাদের মিত্র বাহিনী; মুজাহিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর গাদ্দার শাসকদের গোলামি (موالاة) করাই এদের কাজ।

চতুর্থ ইমান ভঙ্গের কারণ: সামরিক আদালতের শরণাপন্ন হওয়া।

যারা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানে বিচার চায়, তারা কাফের। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

{أَلَـمْ تَـرَ إِلَى الَّذِيـنَ يَـزْ عُمُـونَ أَنَّهُـمْ آمَنُـواْ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَيْـكَ وَمَـا أُنـزِلَ مِـن قَبْلِـكَ يُرِيـدُونَ أَن يَتَحَاكَمُـواْ إِلَى الطَّاغُـوتِ وَقَـدْ أُمِـرُواْ أَنْ يَكْفُـرُواْ بِـهِ وَيُرِيـدُ الشَّـيْطَانُ أَن يُضِلَّهُـمْ ضَلاَلاً بَعِيـدًا} [النساء: ٦٠]،

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে— আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা ঈমান এনেছে। অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।” [সূরা নিসা: ৬০], আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥]

“অতএব, তোমার রবের কসম, সে লোকেরা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ না করে।” [সূরা নিসা: ৬৫], সুতরাং, সেনাবাহিনী যেহেতু আল্লাহর শরিয়াহ বাদ দিয়ে সামরিক আদালতের নামে মানব রচিত তাগুতি আইনের শরণাপন্ন হয়, এজন্য তারা কাফের।

এপর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম সেনাবাহিনীর ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলো। এখন দেখবো তাদের মধ্যে তাকফীরের শর্তগুলি বিদ্যমান কি-না, আর দেখবো তাকফীরের কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি-না।

তাকফীরের শর্তাবলী:

প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত: প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হওয়া।

সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত বয়স্ক (বালেগ) এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় শর্ত: ইলম তথা, জানা।

তাকফিরের একটি শর্ত হলো ইলম, যা মূলত হুজ্জাহ বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা বুঝায়। তবে এই হুজ্জাহ কুরআন ও হাদীস এর বিদ্যমানতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেহেতু তাদের সামনে কুরআন ও হাদিস রয়েছে, এবং তারা যেসমস্ত বিষয়ে কুফরি করছে সেগুলো ইসলামের একেবারে অপরিহার্য মৌলিক বিষয়; সুতরাং তাদের উপর হুজ্জাহ কায়েম হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ বলে, তারা কুরআন জানে না—তাহলে বলবো, যে ব্যক্তি হুজ্জাহ (দলীল-প্রমাণ) জানার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য না-জানার অজুহাত (ওজর) গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থ শর্ত: ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া, এটি ইকরাহ এর বিপরীত। সেনারা মোটেও বাধ্য (বা ইকরাহ এর আওতাধীন) নয়। তাদের ক্ষেত্রে বরং ইকরাহের কোন সুযোগই নেই। কারণ, অন্যের অধিকারে ইকরাহ (إكراه المتعدي) সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া ইকরাহের কিছু শর্ত-সীমা রয়েছে, যা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অনুবাদকের নোট:
ইকরাহ অর্থ বাধ্য করা। যেমন কাউকে হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকি দিয়ে শিরক করতে বাধ্য করলো। উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তিকে কুফরের জন্য বাধ্য করা হয়েছে সে যদি জীবন বাঁচানোর জন্য কুফরী কোন বাক্য বলে ফেলে বা কর্ম করে বসে অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচল, তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে না। [বিস্তারিত দেখুন: সূরা নাহল: ১০৬]
তবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্যের ক্ষতি করার বৈধতা শরিয়াহ দেয় না। ফিকহের ভাষায় এটাকে إكراه المتعدي বলা হয়। যেমন- কাউকে নির্দোষ মানুষ হত্যা করতে বাধ্য করা, বা মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

পঞ্চম শর্ত: القصد -ইচ্ছাকৃতভাবে করা। এটা ভুলের (الخطأ) বিপরীত শব্দ।
আর সেনারা তাদের প্রতিটি কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবেই করে। এখানে القصد দ্বারা قصد الفعل তথা, কাজের ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাকফীরের ক্ষেত্রে قصد الكفر তথা, কুফরের নিয়ত আছে কি নেই সেটা ধর্তব্য নয়। আল-কুরআনের বহু জায়গায় এর দলীল রয়েছে। ইমাম তাবারী, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমগণও একই কথা বলেছেন।
তাকফীরের শর্তাবলী আলোচনা শেষে আমরা দেখলাম সবগুলো শর্তই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এখন আমরা তাকফীরের মাওয়ানী তথা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখবো সেনাদের তাকফির থেকে বিরত রাখে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি-না।

প্রথম প্রতিবন্ধক: জাহালাত বা অজ্ঞতার ওযর।
অজ্ঞতা তাকফিরের সাধারণ প্রতিবন্ধক নয়। বরং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রেই কেবল এটি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আলেমগণ দ্বীনের বিষয়গুলিকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেন।

প্রথম প্রকার: আসলুদ দ্বীনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। আসলুদ-দ্বীন হচ্ছে দ্বীনের মূল বিষয়, যা প্রত্যেক নবী-রাসূলের দাওয়াতে অভিন্ন ছিলো, আর তা হলো— এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা। অতএব যে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, সে হোক আলেম কিংবা মূর্খ-জাহেল, তাকে মুশরিক বলা হবে। এই ক্ষেত্রে জাহালতের ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। তার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। যেমন-

নাম বা উপাধি হচ্ছে কর্তার কাজের বিশেষন। অর্থাৎ, যে শিরক করে তার নাম হবে মুশরিক, তাকে 'মুওয়াহহিদ' বলা সংজ্ঞা, যুক্তি ও ফিতরাতের পরিপন্থী। কারন মুওয়াহহিদ হল, যে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করে; আর মুশরিক হল, যে আল্লাহর ইবাদাতে অন্যকে শরীক করে। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাছাড়া অন্ধকার জাহিলিয়াতের যুগেও যারা শিরক করেছে তাদেরকে আল্লাহ তায়া'লা মুশরিক বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেন :

{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ}

"আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দিন।" [সূরা তাওবা: ৬], এখানে তারা হুজ্জাহ বা তাওহীদের দলীল-প্রমাণ শোনার আগেই আল্লাহ তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। তবে, শাস্তি প্রদানের জন্য হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া শর্ত। যেমন আল্লাহ বলেছেন: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} "আর আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই।" [সূরা ইসরা: ১৫], ফলে এ কথা স্পষ্ট যে, মুশরিক বলার জন্য হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা জরুরি নয়; তবে শাস্তি দেওয়ার আগে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করতে হয় । এটাই নামকরণ (اسم) এবং হুকুম প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য। মূল কথা, আলেমদের মত হলো, আসলুদ দ্বীনে কারও অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রকার: আসলুদ দ্বীন ছাড়াও দ্বীনের এমন কিছু স্পষ্ট বিধান রয়েছে যা না জানলেই নয়। এগুলোকে মাসায়েলে যাহেরা (المسائل الظاهرة) বলা হয়, যা সাধারণ ও বিশেষ—সব মুসলিমরাই জানে। এ ধরনের মাসআলায় কারো অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অজ্ঞতার কোন যৌক্তিক কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন, সে মাত্র নতুন মুসলিম হলো, অথবা সে এমন দূরবর্তী মরু অঞ্চলে বসবাস করে যেখানে দ্বীন জানা সম্ভব নয়। এখানে মূলনীতি হলো অজ্ঞতার এমন কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে যে, সে জানার চেষ্টা করলেও তার সামনে কোন পথ খোলা নেই। কিন্তু জানার সুযোগ থাকার পরও যারা অজ্ঞতা লালন করে, তাদের জন্য মাসায়েলে যাহেরার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে নওমুসলিম হয়। কারণ সে ব্যক্তি দ্বীন শেখার ব্যাপারে উদাসীন ও বিমুখ।

তৃতীয় প্রকার: المسائل الخفية - মাসায়েলে খাফিয়্যাহ: দ্বীনের সূক্ষ্ম বা জটিল বিষয়সমূহ, যা আলেম ব্যতিত সাধারণ মুসলিমদের জানা থাকে না। এই ধরনের বিষয়ে অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য। খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা-সমূহ আলোচনা করলাম। এখন আমরা দেখবো, সেনাবাহিনী কি স্পষ্ট মাস'আলায় কুফরি করছে, নাকি সুক্ষ্ম মাস'আলায়? যেমন, তারা আল্লাহর শরিয়াহ অনুযায়ী বিচার করতে অস্বীকার করেছে এবং অন্যদেরও বাধা দিয়েছে । তাহলে শরিয়াহ বাস্তবায়নের মাসআলাহটি কি স্পষ্ট মাসআলাহ, নাকি সূক্ষ্ম মাসআলাহ? নিশ্চয়ই এটি স্পষ্ট মাসআলাহ। অতএব, এক্ষেত্রে সেনাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মাস'আলাহটি স্পষ্ট এবং তারা এমন অবস্থানে আছে যেখানে মৌলিক ইলম অর্জনের সুযোগ আছে। অনুরূপ জিহাদও একটি স্পষ্ট মাসআলাহ। কিন্তু তারা জিহাদ করে না, বরং অন্যদেরকে জিহাদে বাধা দেয়। তারা শরিয়াহর দণ্ডবিদি কার্যকর করতে অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকেও এতে

বাধা দেয়—এটাও স্পষ্ট মাস'আলা এবং তারা এমন অবস্থানে আছে যেখানে মৌলিক ইলম অর্জনের সুযোগ আছে। কাজেই, তাদের অজ্ঞতার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই অজ্ঞতা অবহেলাপ্রসূত। তাহলে বুঝা গেলো, সেনাবাহিনীর জন্য অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক: অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে করে ফেলা (الخطأ)
সেনাদের ক্ষেত্রে এই ওযর প্রযোজ্য হবেনা। কারন তারা কাজগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই করে। ভুল হলো— এমন কোনো কাজ করা, যা সে করতে চায়নি। যেমন: সেই বিখ্যাত হাদিসে লোকটি বলেছিল—“হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব। এখানে সে আনন্দের আতিশয্যে ভুল করেছে।”

তৃতীয় প্রতিবন্ধক: তাওয়ীল (বা ব্যাখ্যা)
এ ক্ষেত্রে তাওয়ীলটি অবশ্যই সহনীয় হতে হবে, যাকে ফিকহি পরিভাষায় تأويل سائغ বলা হয়। সহনীয় তাওয়ীল হলো: কোন শব্দের এমন অর্থ গ্রহণ করা যা আরবদের ভাষা রীতিতে প্রচলিত আছে, বা আলেমদের পরিভাষায় সে অর্থটির প্রয়োগ রয়েছে। আর এধরণের তাওয়ীল শুধু আলেমরাই করতে পারেন। কিন্তু সেনারা কোন তাওয়ীলের ভিত্তিতে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাগুতদের সহায়তা করে এবং ইসলামের এতগুলো মৌলিক বিধান প্রত্যাখ্যান করে?! যদি তাদের কোনো তাওয়ীল থেকেও থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সেটি সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল।

চতুর্থ প্রতিবন্ধক: জবরদস্তি বা ইকরাহ।
আচ্ছা, সেনারা কি নিরুপায় হয়ে প্রচণ্ড নির্যাতন ও জেল-জুলুমের কারণে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে? নাকি তারা নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহে এই পেশায় বেছে নিয়েছে? বাস্তবতা হলো: তারা নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে, তাই তারা

ইকরাহ এর আওতাধীন নয়। আর যদি ধরে নিই তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে, তারপরও শরিয়াহ সমর্থিত ইকরাহ তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। কারণ, ইকরাহের কারণে অন্যের জান-মাল ও ঈমান-আমল ধ্বংস করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) আলেমদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন: কোন মুসলমকে যদি বাধ্য করা হয় অপর মুসলিমকে হত্যা করার জন্য, তবে এটি ইকরাহ হিসেবে গণ্য হবে না।
এই ইজমা অনুসারে মানুষের জীবনের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে যেমন ইকরাহ এর ওজর গ্রহণযোগ্য নয়, সুতরাং মানুষের দ্বীনের ক্ষতি করার ক্ষেত্রেও এধরণের ইকরাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ জীবনের হেফাজতের চেয়ে দ্বীনের হেফাজতের অগ্রাধিকার বেশি। সেনাবাহিনীর জন্য ইকরাহ এর ওজর প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, আমরা দেখলাম আলেমগণের উল্লেখিত এই চারটি প্রতিবন্ধকতার কোনোটিই সেনাবাহিনীর ওপর রিদ্দাহর হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

সেনাদের তাকফীরের ক্ষেত্রে কয়েকটি সংশয় আছে, যার ফলে এই মুরতাদদেরকে কিছু মানুষ তাকফীর করতে চায় না। যথা-

প্রথম সংশয়: সেনারা বিভ্রান্ত হয়েছে উলামায়ে সু' এর কারণে।

উত্তর: বিভ্রান্তি (تلبيس) দুই প্রকার:
প্রথমত: দ্বীনের অপরিহার্য মাসায়েল সম্পর্কে বিভ্রান্তি।
এক্ষেত্রে কাউকে অজ্ঞতার ওযর দেওয়া যায় না। কারণ এসব বিষয়ের হুকুম আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্ট। আমরা কেবল কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে আদিষ্ট। এদুয়ের বিরোধী প্রত্যেকটি অভিমত বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য।

যেমন, কোনো আলেম যদি কোনো সাধারণ মুসলিমকে যিনার হুকুম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে বা যিনাকে বৈধ বলে, তবুও সেই সাধারণ মুসলিম উক্ত ভ্রান্তির জন্য ওযর পাবে না, কারণ যিনা হারাম—এটা দ্বীনের অপরিহার্য জানা বিষয়। এমনিভাবে, সেনাদের কুফরি কর্মকাণ্ডসমূহ সবই দ্বীনের মৌলিক ও অপরিহার্য জ্ঞাত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন:- আল্লাহর শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, আল্লাহর প্রদত্ত সকল হদুদ কায়েম করা ইত্যাদি সবই দ্বীনের অপরিহার্য বিষয় যা সকলের জানা থাকা আবশ্যক। অতএব, সেনাদের তাকফীরের ক্ষেত্রে আলেমদের বিভ্রান্তি কোন ওযর নয়; যদিও কেউ তাদের বিভ্রান্ত করে থাকে। কারণ, এইসব বিষয়ের হুকুম আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। তুমি কি শুনোনি আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ} “তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, ফলে তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।” [সূরা আল-আহযাব: ৬৭], আল্লাহ কি তাদের এই ওযর গ্রহণ করেছেন, যে তারা তো তাদের নেতা বা আলেম-উলামাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছিল? আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন:

{يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينِ}

“যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।” [সূরা সাবা: ৩১], এখানেও আল্লাহ ক্ষমতাদর্পীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া সেই দুর্বলদের ওযর গ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয়ত: সুক্ষ্ম ও অস্পষ্ট মাসআলায় বিভ্রান্তি।

এই প্রকার বিভ্রান্তি বৈধ ওযর হতে পারে। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি সুক্ষ্ম মাসআলায় বিভ্রান্ত হয় —তবে স্পষ্টভাবে হুজ্জাহ কায়েম করার আগে তাকে কাফির বলা যাবে না। তাহলে দেখুন, কেউ যদি বিভ্রান্তির অজুহাতে সেনাদের

তাকফির না করে, তাহলে রাফেযি ইমামিয়া শিয়াদেরও কাফির বলা যাবে না। কারণ তারাও তাদের ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত। অথচ মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রাফেযিরা মুরতাদ। যেমন, আবু যার'আহ ও আবু হাতেম আর-রাজী বলেছেন:

"أدركنا العلماء عراقاً وشاماً وحجازاً ويمناً يقولون إن الرافضة رفضوا الإسلام"

“আমরা ইরাক, শাম, হিজায ও ইয়েমেনের আলিমদেরকে পেয়েছি, তাঁরা সকলেই বলতেন, রাফেযীরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে।”

দ্বিতীয় সংশয়:

অনেকে বলেন, সেনারা তো তাদের শাসকদের ‘ওলুল আমর’ তথা আদেশের অধিকারী মনে করে, তাদের আনুগত্য ফরজ মনে করে, এবং মুজাহিদদেরকে মনে করে খারেজি। আর তারা মনে করে খারেজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। তাহলে আপনারা কেন সেনাদের দোষ দেন, তারা তো কেবল উলুল আমরের আনুগত্য করছে?

উত্তর: হুকুম প্রয়োগ হয় বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী, কারো নাম-পরিচয় বা দাবী-দাওয়া এখানে বিবেচ্য নয়। প্রত্যেক বাতিলপন্থী দল নিজেদেরকে মনে করে হক্কের অনুসারী। **আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:**

{كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} [الأنعام: ١٠٨]،

“এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।” [সূরা আন'আম: ১০৮], কুরাইশরাও হারাম শরীফের বাসিন্দা হিসেবে নিজেদেরকে মনে করতো হক্কের ঠিকাদার। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জাদুকর, গণক, কবি ও মিথ্যাবাদী মনে করতো। কিন্তু তাতে কি সত্য বদলে গেছে? বরং বাস্তবতা যেটা সেটাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর তা হলো, মুহাম্মদ ﷺ

আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল আর কুরাইশের কাফেররা মুশরিক। একইভাবে যে খারেজিরা আলী রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের দাবী ছিলে, আলী রা. কাফের হয়ে গেছেন আর তারা নিজেদেরকে হক্কের অনুসারী ভাবতো। এতে কি বাস্তবতা উল্টে গেছে? বাস্তবতা (হাক্বীকত) হলো, আলী রা. তার যমানার শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তিনিই ছিলেন হক্বপন্থী, আর খারেজিরা ছিলো পথভ্রষ্ট ও বিকৃত চিন্তার অধিকারী। সুতরাং কার নাম কি হলো, কে কি দাবী করলো সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়, যদি নাম ও দাবী-দাওয়ার সাথে বাস্তবতার মিল না থাকে।
রাফেযিরা মনে করে, আহলে সুন্নাহ নবী পরিবারের শত্রু, তারা নিজেদেরকে আহলুল বায়তের অনুসারী ও হক্বপন্থী মনে করে। তবুও বাস্তবে রাফেযিরা হলো মুরতাদ, আর আহলুস সুন্নাহ হকপন্থী এবং তারাই সত্যিকার অর্থে আহলুল বায়াতকে ভালোবাসে এবং তাদের পাশে থাকে। ইহুদি-নাসারারাও বলেছিলো, “জান্নাতে কেবল তারাই যাবে যারা ইহুদি, কিংবা যারা নাসারা।”—এতে কি হাকীকত উল্টে গেছে? না, তারাই জাহান্নামে যাবে আর সত্যিকারের মু’মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। মূল কথা, বাস্তবতা-ই আসল, কে কি দাবি করলো আর কি নাম ধারণ করলো তাতে কিছু আসে-যায় না।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন: “হকপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্যই তাদেরকে খারেজি বলে অপবাদ দেওয়া হয়।”
ইবনু গিনাম তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন: “ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব (রহ.)-কেও খারেজি, তাকফিরি ও মুসলিমদের রক্ত হালালকারী বলা হয়েছিল।” অথচ তিনি ছিলেন তাওহিদের ইমাম, দ্বীনের মুজাদ্দিদ। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করেছেন এবং মানুষের মাঝে তিনি তাওহীদের পুনর্জাগরণ তৈরী করেছেন।

সুতরাং বাস্তবতা সামনে রেখেই যদি বিচার করতে হয়, তাহলে আজকের বাস্তবতা হলো:

মুসলিমদের শাসকরা কুফরের কোন দরজা অবশিষ্ট রাখেনি, সবগুলোতেই প্রবেশ করেছে। তারা আল্লাহর শরিয়াহ বর্জন করে মানব-রচিত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, জাতিসংঘের কাছে বিচার চায়, আল্লাহর সাথে বিধান রচনায় অংশ নেয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদের সাহায্য করে এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এগুলোর পরে আর কোন কুফর অবশিষ্ট আছে কি? সুতরাং এটাই বাস্তব সত্য যে, এই শাসকরা কাফের ও মুরতাদ, আর তাদের বাহিনীগুলো তাদের পাহারাদার ও প্রতিরক্ষাকারী। শাসকদের সব কুফরি নির্দেশ বাস্তবায়ন করে এই সেনারা। এরাই হক্বের বিপরীতে বাতিলকে টিকিয়ে রাখে। বাতিলের প্রতিটি পদক্ষেপে এরা পাশে থাকে। এটাই তাদের হাকীকত। পক্ষান্তরে, মুজাহিদগণের হাকীকত হলো, তারা আল্লাহ অনুগত ওলি, বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাসিন্দা। এবার উভয় দলের হাকীকত সামনে রেখে বিচার করুন। কারণ, আলেমগণ বলেন:

"العبرة بالحقائق، لا بالمسميات"

হুকুম প্রয়োগ হয় কাজ ও বাস্তবতা অনুসারে। নাম বা দাবী-দাওয়া অনুসারে নয়

সর্বশেষ সংশয়: এ সমস্ত সৈনিকেরা জানেই না যে তাদের কাজ কুফরি, আর যদি জানত, তাহলে তা পরিত্যাগ করত।

উত্তর:

তাকফীরের পঞ্চম শর্ত القصد (আল-কাসদ) এর আলোচনায় এর উত্তর পেয়ে যাবেন। সেখানে আমরা বলেছি, আল-কাসদ দ্বারা কুফরের ইচ্ছা নয় বরং কাজের ইচ্ছাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাকফীরের ক্ষেত্রে সে কাফের হওয়ার নিয়তে কুফর করেছে কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং কুফরি কাজটি সে

ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে নাকি ভুলে করেছে সেটাই বিবেচ্য। নিচে কিছু দলিল পেশ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ"

“তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, তারা বলবে—আমরা তো কেবল কৌতুক করছিলাম। বলো, আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ? অজুহাত দিও না—তোমরা ঈমান আনার পর কুফর করেছ।” [সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: “এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কাফের হওয়ার ইচ্ছায় কুফর করেনি। বাস্তবে, খুব কম মানুষই কাফের হওয়ার নিয়তে কুফর করে। বেশিরভাগ মানুষই কুফরীতে জড়িয়ে পড়ে, অথচ সে জানেই না সে কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

"أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْن"

“যাতে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যায় অথচ তোমরা তা টেরও পাবে না।” [সূরা হুজুরাত: ২], আলেমগণ বলে, আলোচ্য আয়াতে কুফরের ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, কুফরের উপর মৃত্যুবরণ ছাড়া এমন কোন কারণ নেই যে সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া এই আয়াত থেকে বুঝা যায়— তারা কুফরের ইচ্ছে পোষণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

"فَرِيْقًا هَدَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَة إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْن"

“একদলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন, আর অপর দল পথভ্রষ্ট হয়েছে; তারা শয়তানদের বন্ধু বানিয়েছে আল্লাহর পরিবর্তে এবং মনে করে তারাই সঠিক পথে রয়েছে।” [সূরা আ'রাফ: ৩০]

ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন: “এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে তাদের কথা ভুল প্রমাণিত হয়, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা কারো গুনাহের কারণে, বা ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করার কারণে শাস্তি দিবেন না, যদি না সে সঠিক বিধান জানার পরও রবের অবাধ্যতাবশত সে কাজে লিপ্ত হয়। যদি এমন হতো, তাহলে যেসকল পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সত্য জ্ঞান না থাকায় কুফর করে অথচ নিজেদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে, তাদের মাঝে আর হেদায়েতপ্রাপ্ত দলের মাঝে কোন পার্থক্য থাকতো না।” তাবারি রহিমাহুল্লাহ-এর এই কথার অর্থ হলো, তাকফিরের ক্ষেত্রে কুফরের ইচ্ছা ধর্তব্য নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف ٤ ١٠:١٠٣]،

“বলুন: আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সংবাদ দেব, যাদের আমল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? যাদের দুনিয়ার চেষ্টা-সাধনা কোন কাজে আসেনি, কিন্তু ভেবেছে তারা খুব ভালো কাজ করছে।” [সূরা কাহাফ: ১০৩–১০৪], দেখুন, আল্লাহ তা'য়ালার ভাষ্যমতে তারা আমলের দিক থেকে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। অথচ তারা নিজেদেরকে মনে করতো সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল। অর্থাৎ, তারা কুফরি কাজ করেছে কাফের হওয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য! তারপরও তারা কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

" هل أتاك حديث الغاشية * وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارًا حامية "

“তোমার কাছে কি এসেছে গাশিয়ার ঘটনা? সেদিন কিছু চেহারা থাকবে বিনীত, পরিশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত, কিন্তু তারা দগ্ধ হবে উত্তপ্ত অগ্নিতে।”

[সূরা গাসিয়াহ: ১-৪]

এই বিনীত লোকগুলো কি এত চেষ্টা সাধনা করেছে কাফের হওয়ার জন্য? নাকি

তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করছে ভেবে এসব কুফর করেছে? অবশ্যই কাফের হওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না, তবুও আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করেছেন।

সুতরাং, যারা কুফরি কাজ করে—নিয়ত থাক বা না থাক—তারা কাফের হিসেবে গণ্য হবে। যদি কেউ কুফরের নিয়তকে শর্ত মানে, তবে সে রাফেযী, সুফী মুশরিক, এমনকি ইহুদি-নাসারাদেরও কাফের বলতে পারবে না। কারণ এদের কেউই কুফরের নিয়ত করে না। অথচ তারা কুফরেই নিমগ্ন। কাজেই, এসব দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো, যারা নিয়তকে কুফরের শর্ত করে তাদের এই কথা বাতিল এবং কুরআন-সুন্নাহ ও আলেমদের ফতোয়া পরিপন্থী। উপরের আলোচনার সারকথা হলো: সেনাবাহিনীর কুফরি কাজগুলো ইচ্ছাকৃত। কারণ তারা স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে এবং তাগুতের বাহিনীতে যোগদান করেছে। আল কাসদ (القصد) দ্বারা এই কর্মের ইচ্ছাটাই উদ্দেশ্য, কুফরের নিয়ত আছে কি নেই সেটা তাকফীরের ক্ষেত্রে কোন শর্ত বা বিবেচনার বিষয় নয়।

পরিশেষে একটি মাসআলাহ দিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করবো।
সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যই কি মুরতাদ?
উত্তর: হ্যাঁ, প্রত্যেকে মুরতাদ। এবার বিস্তারিত জানুন।

সেনা সদস্যরা দুই প্রকার:

১. কিছু সদস্য সরাসরি কুফরি কাজে নিয়োজিত: যেমন—কুফরি শাসন টিকিয়ে রাখা, কুফরি বিধান বাস্তবায়ন করা, তাগুত শাসকদের রক্ষা করা, দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কাফেরদের সহায়তা করা ইত্যাদি কুফরি কাজ তারা সরাসরি করে থাকে।

২. আরেক দল সরাসরি কুফরি কাজে নিয়োজিত নয়, তবে তারা প্রথম দলের সহযোগী।

এখন যারা প্রত্যক্ষভাবে অপরাধে জড়িত না থাকলেও মূল অপরাধীকে সহযোগিতা করে কিংবা সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে তাদের বিষয়ে তিনটি ফিকহি মূলনীতি রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় তাগুতের সেনাবাহিনীর সকল সদস্য মুরতাদ এবং তাদের হুকুম অভিন্ন।

প্রথম মূলনীতি: আলেমগণ বলেন,

"الرديء كالمباشر"

“সরাসরি জড়িত অপরাধীর যে হুকুম, পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরও সে হুকুম ।” এখানে পরোক্ষভাবে জড়িত বলতে বুঝানো হয়েছে— যে মূল অপরাধীকে সাহায্য-সহযোগিতা করে কিংবা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। সুতরাং, মূল অপরাধী মুরতাদ হলে তার সহযোগীও মুরতাদ হবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: আলেমগণ বলেন-

"الطائفة التي ينصر بعضها بعضا لها حكم واحد"

“যে দলের সদস্যরা একে অপরকে সহযোগিতা করে, সে দলের যে হুকুম সদস্যদেরও সে হুকুম।” দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ}

“নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী অপরাধী ছিলো।” [সূরা কাসাস: ৮], যেহেতু সেনা সদস্যরা যেকোন প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসে, সুতরাং সমগ্র বাহিনীর উপর একই হুকুম বর্তাবে।

তৃতীয় মূলনীতি: আলেমগণ বলেন:

"حكم أفراد الطائفة كحكم رؤوسهم"

“দল নেতার যে হুকুম, সদস্যদের সে হুকুম।” সুতরাং, সেনাবাহিনীকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের যে হুকুম, সেনাবাহিনীরও সে হুকুম। তাদের নেতারা যেহেতু মুরতাদ, সুতরাং তারাও রিদ্দার সমান অংশীদার সাব্যস্ত হবে। আর এই সেনাবাহিনী তো গাইরুল্লাহর গোলামি করে। তারা তাগুত শাসকদের গোলাম, তারা ইহুদি ও নাসারাদের গোলাম।

সুতরাং, সেনাসদস্যদের উচিত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, এবং তাওবাহ করে ফিরে আসা। আল্লাহর কসম, হে সেনাসদস্যরা! সত্যিই কিয়ামতের দিন তোমাদের থেকে দায়মুক্তি নেবে সেইসব দরবারি আলেমেরা, যারা আজ তাগুত শাসকদের খুশি রাখার জন্য দ্বীন বিক্রি করছে। তারা নিজেদের স্বার্থ আর বৈষয়িক লাভের জন্য দুনিয়ায় তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে, আর পরকালের ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তুমি যদি সম্মান ও ইজ্জতের জীবন চাও, তবে এই নিকৃষ্ট কুফরি পেশা ছেড়ে দাও। অতঃপর জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ'র জন্য বেরিয়ে যাও। এখানেই পাবে তুমি দুনিয়ার ইজ্জত ও আখেরাতের সফলতা।

হে সেনাসদস্য, তুমি কি জানো না—তোমার রিজিক তোমার মায়ের গর্ভেই নির্ধারিত হয়ে গেছে? তবে কেন তুমি হারাম উপার্জন করো?

আল্লাহর কসম! তুমি তোমার সব রিজিক ও নির্ধারিত জীবনকাল পূর্ণ না করা পর্যন্ত মরবে না। তুমি কি ভয় করো যে অভুক্ত থেকে মরবে? জেনে রেখো—যদি তুমি ক্ষুধায় মরেও যাও, তবু ইসলামের ওপর অটল থাকো, তবে তুমি সফল হবে। কারণ প্রকৃত আনন্দ, প্রকৃত সফলতা তো জান্নাতে। জানো কি—সেই জান্নাতি ব্যক্তির কথা, যার রাজত্ব এত বিস্তৃত হবে যে, তার একপ্রান্ত থেকে

আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত হাঁটতে গেলে দুই হাজার বছর লেগে যাবে? জান্নাতেই আছে আসল ধন-সম্পদ, আসল রাজত্ব। হাদীসে এসেছে—একজন জান্নাতি বলবে: আল্লাহ যদি অনুমতি দেন, তবে আমি জান্নাতের সকল অধিবাসীকে খাওয়াতে পারি, কারণ আল্লাহ আমাকে এত রিজিক দান করেছেন। জান্নাতে একজন মুমিনের জন্য থাকবে ৮০ হাজার খাদেম এবং একটি মুক্তার তৈরি বিশাল প্রাসাদ, যার উচ্চতা হবে ৬০ মাইল! জান্নাতে তোমার জন্য থাকবে—তোমার প্রাণ যা চায়, চোখ যা দেখে শান্ত হয়—সব কিছুই।

হে সেনাসদস্য! তুমি কি এই মহান জান্নাতি রাজত্বকে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে চাও? আর এই টাকার সাথে কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও অপমান রয়েছে তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন!

আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের হিদায়াত দান করেন, তাঁর প্রিয় ও পছন্দের আমলগুলো করার তাওফীক দান করেন। সলাত, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ -এর উপর। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।